Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 46 – 55
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

বঙ্গানুবাদে মেঘদূত : বিচ্ছুরিত পুনঃপাঠ

সঞ্চারী হালদার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : haldersanchari@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword

Translation studies, Source text, Target Text, Reproduction, Refraction, Rewriting, Mahakavi Kalidasa, Dwijendranath Tagore, Buddhadev Basu, Explanatory translation, Interlingual Translation.

Abstract

In the 4th century AD, the great poet Kalidasa composed 'Meghadutam' in Sanskrit, in Mandakranta rhythm. In this text, a Yaksha, exiled to the Ramgiri mountain for dereliction of duty, sent a cloud as a messenger to his solitary lover at Alkapuri on the arrival of monsoons. The famous poet Rabindranath Tagore observed the suffering of seperation of all people in the midst of the Yaksha's wretchedness. Even in 21st century, this poetry has great effects on the reader's mind in various ways. The 'Meghadutam' has been written and studied in Bengali language in two ways mainly. The initial practice is a direct translation of the Sanskrit poem. On the other hand, modern poets have adopted Meghadutam's style and have taken a vow to write 'Uttar-Meghadutam' in their own way. In the present research article, we discussed about the various Bengali translations of 'Meghadutam'.

Translation is no longer treated as a mere imitation of the original text or the translator a mere copyist. According to modern translation studies, translation becomes a new creation when the translator interprets the topic, mood, and symbols of the source text and transforms it into the language and culture of the target text. The translated text itself becomes a new text or reproduction of the original work. It's no longer called as a reflection of the original text, rather it can be called as refraction. André Lefevere developed the idea of translation as a form of rewriting.

In 1850, Meghdoot's Bengali translation was started by Anandachandra Shiromani. From then till now, more than thirty-six Bengali translations have been found. The translation of any ancient literature makes that a part of contemporary living literature. Translation is not only as a form of communication but also as continuity. For the purpose of detailed discussion two translated texts in poetry form, have been selected from the vast collection of Bengali 'Meghdoot'. The first text is 'Meghdoot' translated by Dwijendranath Tagore [publication year: 1859], the other is 'Meghdoot' by Buddhadeva Bose [publication year: 1957]. Translations do not only represent the original text; but also show the era of the translator and the personality of the reproducer. Through a

comparative discussion of two works translated almost a hundred years apart, we will try to understand how the two translators managed to create distinct new texts while following the original.

Discussion

১

খ্রিষ্টিয় চতুর্থ শতকে মহাকবি কালিদাস সংস্কৃত ভাষায়, মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচনা করেন 'মেঘদূতম্'। এই খণ্ডকাব্যে কর্তব্যে অবহেলার জন্য রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত এক যক্ষ বর্ষার আগমনে মেঘকে দূত করে পাঠিয়েছিল অলকাপুরীতে তার বিরহিনী প্রিয়ার কাছে। যক্ষের এই বিরহবার্তার মধ্যে বিশ্বের বিজন বিরহ বেদনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই একবিংশ শতাব্দীতেও কাব্যটি রসিক পাঠকচিত্তকে নানাভাবে আলোড়িত করে। বিশ্বের প্রাচীনতম এই রোমান্টিক প্রণয়গীতিকাটি দুই ভাবে বাংলা ভাষায় চর্চিত হয়ে এসেছে। প্রাথমিক ধারাটি হল সংস্কৃত কাব্যটির প্রত্যক্ষ অনুবাদ। দ্বিতীয় ধারায় আধুনিক কবিরা মেঘদূতের ভাব আত্মস্থ করে নিজেদের মতো করে তার উত্তরভাষ্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন। বর্তমান গবেষণা নিবন্ধের লক্ষ্য মেঘদূতের বঙ্গানুবাদগুলি। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে আনন্দচন্দ্র শিরোমণির হাত ধরে মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ শুরু হয়েছিল। তারপর থেকে একুশ শতক পর্যন্ত প্রায় ছত্রিশটির বেশি বঙ্গানুবাদ খুঁজে পাওয়া যায়।

এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় অনুবাদের ইতিহাস অতি প্রাচীন হলেও অনুবাদ নিয়ে তাত্ত্বিক চর্চা শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে। ১৯৭৬ সালে বিশিষ্ট অনুবাদতাত্ত্বিক André Lefevere দাবি করেন যে,

> "অনুবাদ এখন আর নিছক অধ্যবসায়ী ও বিচ্ছিন্ন কোনো লিখনপ্রয়াস নয়; বিদ্যাচর্চার নবীনতম শাখা হিসেবে তা পৃথক মর্যাদার অধিকারী।"[১]

অনুবাদ এখন আর নিছক মূলের অনুকরণ বা অনুবাদক নিছক নকলনবিশ নন। আধুনিক অনুবাদতত্ত্ব অনুযায়ী, অনুবাদক যখন উৎসপাঠের বিষয়, ভাব, সংকেতাবলীর পাঠোদ্ধার করে তাঁকে উদ্দিষ্ট পাঠের ভাষায়, সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করেন, তখন অনুবাদ হয়ে ওঠে নতুন সৃষ্টি। উৎসপাঠ ও উদ্দিষ্টপাঠের ভাষার ব্যাকরণ, অন্বয়গত পার্থক্য, চিহ্নায়নের পার্থক্য; সর্বোপরি মূল লেখক ও অনুবাদকের লিখনশৈলির পার্থক্য, সংস্কৃতিগত পার্থক্য, প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য এবং ভিন্ন যুগচেতনা— এই সবের ভিত্তিতে মূল পাঠ থেকে অনূদিত পাঠটি পৃথক হয়ে যায়। অনুবাদকে মূল পাঠের প্রতিবিম্ব তাই আর বলা যায় না। মূল লেখার বিচ্ছুরণে তৈরি হয় স্বতন্ত্র পাঠ। প্রাবন্ধিক অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য মহাশয় পরিভাষা ব্যবহার করেছেন 'বিচ্ছুরিত পুনঃপাঠ'[২]।

যেকোনো প্রাচীন সাহিত্যের অনুবাদ সেই সাহিত্যকে সমকালীন সজীব সাহিত্যের অংশ করে তোলে। 'The Task of the Translator' প্রবন্ধে Walter Benjamin বলেছেন, "Translation is not only as a form of communication but also as continuity." এই নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনার উদ্দেশ্যে বাংলায় অনূদিত মেঘদূতের সুবিশাল ভাণ্ডার থেকে দুটি পদ্যাকারে রচিত অনুবাদ বেছে নেওয়া হয়েছে। একটি হল দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত 'মেঘদূত' [প্রকাশকাল: ১৮৫৯], অন্যটি হল বুদ্ধদেব বসুর 'মেঘদূত' [প্রকাশকাল : ১৯৫৭]। অনুবাদ শুধুমাত্র মূল রচনার প্রতিনিধিত্ব করে না; অনুবাদকের যুগের ও লেখকের ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেয়। প্রায় একশ বছরের ব্যবধানে অনূদিত দুটি রচনার তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে চেষ্টা করব কীভাবে মূলকে অনুসরণ করেও অনুবাদকদ্বয় স্বতন্ত্র নতুন পাঠ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। অনুবাদতাত্ত্বিক James S *Holmes–এর মতে, কোনো রচনার অনুবাদ এবং সেই অনুবাদের তাত্ত্বিক সমালোচনা*— এই দুটিই Applied Translation Studies-এর অন্তর্ভুক্ত।

২

বাংলায় মেঘদূত অনুবাদ শুরু হয় উনিশ শতকের মধ্যভাগে। ভারতে ব্রিটিশ শাসন কায়েম হওয়ার পরে মূলত ইউরোপীয় পণ্ডিতদের প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ ও আনুকূল্যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে বঙ্গদেশে বিপুল চর্চা শুরু হয়েছিল; যা বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশেষভাবে জারি ছিল। এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

> "আমরা উন্নতি অর্থে বুঝি হয় বর্তমান ইউরোপের দিকে এগনো নয় অতীত ভারতবর্ষের দিকে পিছনো।...আমাদের এ যুগ সত্যযুগও নয় কলিযুগও নয়— শুধু তরজমার যুগ।"[৩]

মহাকবি কালিদাস আধুনিক যুগে প্রথম অনূদিত হয় ইংরাজি ভাষায়। ১৮১৩ সালে হোরেস হেম্যান উইলসন কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন ইংরাজি অনুবাদ ও টীকা সম্বলিত কাব্যগ্রন্থ 'The Megha Duta or Cloud Messenger'. বাংলায় প্রথম মেঘদূত অনুবাদ করেন আনন্দচন্দ্র শিরোমণি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে। এই গ্রন্থে প্রথমে মূল কাব্য, পরে গদ্যানুবাদ ও সবশেষে কবিরত্ন চক্রবর্তী রচিত সংস্কৃত টীকা বাংলা হরফে মুদ্রিত হয়েছে। কাব্যের অনুবাদ কাব্যাকারে করা সমীচীন— এই ভাবনা থেকে প্রথম পদ্যাকারে মেঘদূত অনুবাদ করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৫৯ সালে। তাঁর কাব্যে পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ বিভাগ আছে তবে শ্লোক বিভাজন নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে জ্যেষ্ঠভ্রাতার মেঘদূত নিমগ্নতার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। এছাড়া উনিশ শতকে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি মেঘদূতের বঙ্গানুবাদে উদ্যোগী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন— ভুবনচন্দ্র বসাক (১৮৬১), নীলমণি নন্দী (১৮৭২), ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৭৬), রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৭) প্রমুখ। বিশ শতকের উল্লেখযোগ্য অনুবাদক হলেন— সতীশচন্দ্র রায় (১৯০৬), নরেন্দ্র দেব (১৯২৯), বুদ্ধদেব বসু (১৯৫৭), কালিদাস রায় (১৯৬৩), কল্যাণীশঙ্কর ঘটক (১৯৯৯) প্রমুখ। একুশ শতকেও মেঘদূত অনুবাদের খোঁজ মেলে। দুলাল আচার্য ২০০৩ সালে মন্দাক্রান্তা ছন্দে পূর্বমেঘ উত্তরমেঘ বিভাগ বজায় রেখে একশ আঠারোটি শ্লোকে সমিল বঙ্গানুবাদ করেছেন।

মেঘদূতের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ না করলেও এই কাব্যানুবাদের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনাকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'মানসী' কাব্যের 'মেঘদূত', 'একাল ও সেকাল' কবিতায়, 'চৈতালি' কাব্যের 'মেঘদূত', 'পুনশ্চ' কাব্যের 'বিচ্ছেদ', 'শেষ সপ্তকে'র আটত্রিশ সংখ্যক কবিতা, 'নবজাতকে'র 'সাড়ে নটা' কবিতা, 'সানাই' কাব্যের 'যক্ষ' কবিতায় মেঘদূত ও যক্ষের কাহিনি বারংবার ফিরে এসেছে। 'মন মোর মেঘের সঙ্গী' বা 'বহুযুগের ওপার হতে' ইত্যাদি গানে কবিগুরুর মেঘদূত ভাবনা অনুরণিত হয়েছে। কালিদাসের মেঘদূত ভাবনা রবীন্দ্রমননে নবরূপ পরিগ্রহ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ যক্ষ-যক্ষিণীর পার্থিব বিচ্ছেদে থামতে পারেননি। কবিচেতনায় যক্ষ হয়ে উঠেছে অনন্তকালের বিরহী প্রেমিক; আর যক্ষিণী 'সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি'। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে অতলস্পর্শী বিরহ— লুপ্ত সৌন্দর্যের জন্য আদিগন্ত হাহাকার। প্রাচীন সাহিত্যের 'মেঘদূত' প্রবন্ধে তাই তিনি লিখছেন,

> "আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি, সে আপনার মানস সরোবরের অগম তীরে বাস করিতেছে, সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার পথ নাই।"

৩

প্রখ্যাত অনুবাদতাত্ত্বিক Roman Jacobson তাঁর 'Linguistic aspects of Translation' (১৯৫৯) প্রবন্ধে অনুবাদের তিনটি ধারার কথা বলেছেন— Interlingual Translation, Intralingual Translation এবং Intersemiotic Translation. আমাদের আলোচিত মেঘদূতের বঙ্গানুবাদগুলি Interlingual বা Proper Translation –এর অন্তর্গত। André Lefevere–এর মতে সাত রকমভাবে এই অনুবাদ সম্ভব। ধ্বনিগত, আক্ষরিক, মিলযুক্ত, অমিত্রাক্ষর, ছন্দগত, কবিতা থেকে গদ্যরূপ এবং ব্যাখ্যামূলক। বর্তমান নিবন্ধে আলোচ্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর করেছেন মিলযুক্ত অনুবাদ, অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসু করেছেন মিলহীন অনুবাদ।

মূল সংস্কৃত কাব্যটি ছিল মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত। মন্দাক্রান্তা সমবৃত্ত ছন্দ, প্রতিটি চরণে সতেরো অক্ষর। এই ছন্দের গণ— ম ভ ন ত ত গ গ। পর্ব চার, মাত্রা ৮-৭-৭-৫। বাংলা পদ্যছন্দে মন্দাক্রান্তার গুরুলঘু স্বরক্রমে অনুবর্তন দুরূহকর্ম। তবু কবিগণ এই নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। কবি যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার (২৭ মাত্রা), কান্তিচন্দ্র ঘোষ (২৬ মাত্রা), অসিতকুমার হালদার (২৩ মাত্রা), প্যারীমোহন সেনগুপ্ত (২৬ মাত্রা), ক্ষিতিনাথ ঘোষ (২০ মাত্রা), কবিশেখর কালিদাস রায় (২০ মাত্রা) প্রমুখ মন্দাক্রান্তার লঘু-গুরু ভেদ বজায় রেখে বঙ্গানুবাদ করেছেন। আবার আনন্দচন্দ্র শিরোমণি (১৮৫০), রাজশেখর বসু (১৯৪২) করেছেন মেঘদূতের গদ্যানুবাদ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্দাক্রান্তা ছন্দে অনুবাদ

না করলেও তাঁর অন্ত্যমিলযুক্ত অনুবাদটি বেশ সুখপাঠ্য। ১৮৫৯ সালে তিনি যখন মেঘদূতের অনুবাদ করছেন, তখন সবেমাত্র বাংলা কবিতার আধুনিক যুগ আরম্ভ হয়েছে। মধ্যযুগ থেকে বাহিত হয়ে আসা মিশ্রকলাবৃত্তের অন্তর্গত পয়ার ত্রিপদী চৌপদী ছন্দেই অভ্যস্ত ছিল বাঙালির দীর্ঘ কবিতা শোনার কান। তিনি তাই যুগের প্রভাব মেনেই সাধুঘেঁষা শব্দে পয়ার (পূর্বমেঘ) ও ত্রিপদী (উত্তরমেঘ) ছন্দে অনুবাদ করেছিলেন মেঘদূত। বুদ্ধদেব বসু আবার ১৯৫৭ সালে যখন অনুবাদ করছেন, তখন বাংলা সাহিত্যে গদ্যকবিতার ধারার প্রচলন হয়ে গেছে। তাঁর বিশিষ্ট অনুবাদরীতি সম্পর্কে কবির নিজস্ব বক্তব্য যে,

> "মূলের বার্তাকে নানা ভিন্নভাবে আক্রমণ করেছি, যাতে বাংলায় চার পংক্তির মধ্যে ধরানো যায়।... যে কোনো অনুবাদেই আমি রূপকল্পগত অবিকল সাদৃশ্যের পক্ষপাতী; উপরন্তু যে ছন্দ স্বভাবত প্রবহমান নয়, তাতে ৪৭২ পংক্তির একটি অ-নাটকীয় কাব্যে অন্ত্যমিল দিতে গেলে একঘেয়েমি এড়ানো অসম্ভব।"[৪]

— এই উপলব্ধি থেকে তিনি প্রতি চরণের শেষপর্বে ধ্বনিগত তারতম্য সৃষ্টি করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পূর্ণ কাব্যটির অনুবাদ কখনো না করলেও প্রথম শ্লোকটির তিনরকম রূপান্তর করে দেখিয়েছেন—

ক. "অভাগা যক্ষ যবে
করিল কাজে হেলা
কুবের তাই তারে দিলেন শাপ—
নির্বাসনে সে রহি
প্রেয়সী - বিচ্ছেদে
বর্ষ ভরি সবে দারুণ জ্বালা।
গেল চলি রামগিরি -
শিখর - আশ্রমে
হারায়ে সহজাত মহিমা তার,
সেখানে পাদপরাজি
স্নিগ্ধ ছায়াবৃত
সীতার স্নানে পূত সলিলধার॥"[৫]

খ. "যক্ষ সে কোনোজনা আছিল আনমনা,
সেবার অপরাধে প্রভুশাপে
হয়েছে বিলয়গত মহিমা ছিল যত—
বরষকাল যাপে দুখতাপে।
নির্জন রামগিরি - শিখরে মরে ফিরি
একাকী দূরবাসী প্রিয়াহারা,
যেথায় শীতল ছায় ঝরনা বহি যায়
সীতার স্নানপূত জলধারা॥"[৫]

গ. "কোনো - এক যক্ষ সে
প্রভুর সেবাকাজে
প্রমাদ ঘটাইল
উন্মনা,
তাই দেবতার শাপে
অস্তগত হল

মহিমা - সম্পদ্
যত - কিছু॥
কান্তাবিরহগুরু
দুঃখদিনগুলি
বর্ষকাল - তরে
যাপে একা,
স্নিগ্ধপাদপছায়া
সীতার - স্নানজলে -
পুণ্য রামগিরি -
আশ্রমে॥"[৫]

— প্রথম অনুবাদটিতে শেষ দুই চরণে ও দ্বিতীয়টিতে চার চরণেই অন্ত্যমিল এবং শেষ অনুবাদটি মিলহীন। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে একযোগে মধ্যমিলও দেখিয়েছেন। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পূর্বোল্লিখিত এই তিনটি অনুবাদের উৎস এক, উদ্দিষ্ট ভাষাও এক এবং অনুবাদক একই ব্যক্তি। তৎসত্ত্বেও শুধুমাত্র প্রকাশভঙ্গি এবং লেখনশৈলির বৈচিত্র্যের কারণে তিনটি পাঠ ভিন্ন হয়ে গেছে। অনুবাদ যদি নিছক 'নকল' হত, তাহলে এই বৈচিত্র্য সম্ভবপর হত না। আধুনিক অনুবাদতাত্ত্বিকেরা এই কারণেই অনুবাদকে 'নির্মাণ' (Craft) না বলে 'সৃজন' (Creation) বলে দাবি করেন। জাক দেরিদার মতে,

> "অনুবাদ-প্রক্রিয়া 'মৌলিক' পাঠকৃতি সৃষ্টি করে। ...অনুবাদ-প্রক্রিয়া আসলে সতীচ্ছদ ছিন্ন করার সঙ্গে তুলনীয়; উৎসপাঠের গভীরে অনুবাদ প্রবেশ করে উচ্ছ্রিত পুরুষাঙ্গের মতো এবং তার একান্ত গোপনকে আলোড়িত করে।"[৬]

অনুবাদক উৎস ভাষার রচনাটিকে প্রথমে পাঠক হিসেবে পাঠ করেন, নিজস্ব যুক্তিবোধ ও সাহিত্যচেতনা অনুযায়ী আয়ত্ত করেন, তারপর মূল রচনার ভাবটি যথাসম্ভব বজায় রেখে উদ্দিষ্ট ভাষার গঠনশৈলি, সংস্কৃতি অনুযায়ী নিজস্ব শৈলির স্বকীয়তা মেনে পুনর্জন্ম দেন। অনুবাদক এক্ষেত্রে Reproducer–এর ভূমিকা পালন করে থাকেন। সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলত যে বিষয়গুলির জন্য পার্থক্য হয়ে যায় সেগুলি হল— দুটি ভাষার অন্বয়গত পার্থক্য, ধ্বনিগত ও ছন্দগত বিভাজন, সংস্কৃতি ও কালগত বিভাজন। আধুনিক বাংলা ভাষায় সন্ধি, সমাসের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, যতিচিহ্নের প্রয়োগ বেড়েছে, দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার কমেছে, তৎসম শব্দের পাশাপাশি তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দের প্রয়োগ বহুলভাবে বেড়েছে। সংস্কৃত বাক্যে পদগুলি বিন্যস্ত হবার কোনো বিশেষ ক্রম না থাকায় পংক্তির অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে; সংস্কৃত কাব্যের চলন ঠিক করে দেয় পুরো শ্লোকের গঠন। বুদ্ধদেব বসু সংস্কৃত শ্লোকের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখছেন,

> "কবিতা ও পাঠকের মধ্যে একটি বুদ্ধির ব্যবধান নিত্য উপস্থিত, পড়ামাত্র কোনো অভিঘাত হবার উপায় নেই।"[৭]

অন্যদিকে আধুনিক বাংলা কবিতা পদের বা পংক্তির চালে চলে। এক একটা শব্দের অভিঘাত কবিতার প্রাণ বলে বিবেচিত হয়। এইসব পার্থক্যের কারণে অনুবাদ কখনোই মূলের প্রতিরূপ হতে পারে না। অনুবাদকেরাও এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবগত থাকতেন। মেঘদূতের গদ্য অনুবাদক রাজশেখর বসু লিখছেন,

> "মেঘদূতের অনেক বাংলা পদ্যানুবাদ আছে। কিন্তু পদ্যানুবাদ যতোই সুরচিত হোক, তা মূল রচনার ভাবাবলম্বনে লিখিত স্বতন্ত্র কাব্য। অনুবাদে মূল কাব্যের ভাব ও ভঙ্গি যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব।"[৮]

প্রতিটি শতকে ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদকের হাতে মেঘদূত নব নব রূপ পরিগ্রহ করেছে। সমালোচক Walter Benjamin প্রাগুক্ত প্রবন্ধে তাই অনুবাদকর্মকে বলেছেন, "a new original in another language."

৪

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বুদ্ধদেব বসু কৃত অনুবাদদুটির উৎস এক হলেও লেখকদ্বয়ের দক্ষতা গুণে দুটি ভিন্ন মেজাজের মৌলিক পাঠ হয়ে উঠেছে। বুদ্ধদেব বসু মোট ১১৮টি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ করেছেন। অন্যদিকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যে কোনো শ্লোক বিভাজন নেই। পূর্বমেঘে প্রতি দুই চরণে অন্ত্যমিল বজায় রেখেছেন। উত্তরমেঘে ত্রিপদী ছন্দ অবলম্বন করেছেন। তাঁর রচনায় শ্লোকপিছু চরণ সংখ্যাও নির্দিষ্ট নয়। যেমন প্রথম শ্লোকের জন্য দশটি চরণ, দ্বিতীয় শ্লোকের জন্য ছটি চরণ, তৃতীয় শ্লোকের জন্য দুটি চরণ ইত্যাদি। অপরদিকে বুদ্ধদেব বসু প্রতি শ্লোকপিছু চার চরণ বরাদ্দ রেখেছেন। "কালিদাসের বক্তব্যকে বিশ্লেষণধর্মী বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা"[৯] — এই ছিল অনুবাদকালে বুদ্ধদেব বসুর প্রধান লক্ষ্য। দুটি উদ্দিষ্ট পাঠের এই প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যগুলি বাদ দিয়ে এবার আসা যাক উৎসপাঠ ও অনুবাদগুলির তুলনামূলক নিবিড় পাঠে।

প্রথম শ্লোক: "কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্ত:
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্তুঃ ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু॥"

— এই শ্লোকটির অনুবাদ করতে গিয়ে 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ' অর্থাৎ 'নিজের অধিকার বা কর্তব্যে প্রমাদযুক্ত বা অমনোযোগী' এই অর্থটিকে আরো বিশ্লেষিত বা পরিবর্ধিত করে দিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

"কুবেরের অনুচর কোনো যক্ষরাজ
কান্তা সনে ছিল সুখে ত্যজি কর্মকাজ।"

প্রিয়ার সঙ্গে সুখে সময় অতিবাহিত করতে গিয়েই যক্ষের কাজে প্রমাদ ঘটেছিল— এই ব্যাখ্যা অনুবাদকের নিজস্ব। অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসু 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ' –এর অনুবাদ মূলানুগই রেখেছেন।

"জনেক যক্ষের কর্মে অবহেলা ঘটল বলে শাপ দিলেন প্রভু।"

এখানে 'কশ্চিৎ যক্ষঃ' (কোনো এক যক্ষ) – এর আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন বুদ্ধদেব বসু— 'জনেক যক্ষ'। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যক্ষের পরিচয়টিও অনুবাদে তুলে ধরেছেন, 'কুবেরের অনুচর কোনো যক্ষরাজ'। 'কান্তাবিরহগুরুণা' অর্থাৎ 'প্রেমিকার বিরহজনিত গুরুভার' এই অর্থটি বুদ্ধদেব বসু হুবহু এক ('বিরহ গুরুভার') রাখলেও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন—

"প্রবাসে যাইতে হবে নাহি তায় খেদ
ভাবে কিন্তু দায় বড় প্রিয়ার বিচ্ছেদ।"

অর্থাৎ 'বিরহ গুরুভার' হয়ে গেল বড় দায়। অর্থ এক থাকলেও প্রকাশভঙ্গির এই ভিন্নতা দুটি পাঠকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। 'স্নিগ্ধছায়াতরুষু' অর্থ স্নিগ্ধ ছায়াপ্রধান তরুরাজিবেষ্টিত। এই শব্দটিও কাব্যিকভাবে প্রয়োগ করলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

"রবিতাপ ঢাকা পড়ে বিপিন বিতানে।"

এর ফলে 'বিপিন বিতান' এই শব্দজোড়ের অনুপ্রাস যেমন শ্রুতিমধুর হল; তেমনই বাংলা কবিতার পংক্তি হিসেবে অনুবাদটি যোগ্যতর হল। বুদ্ধদেব বসু এক্ষেত্রেও মূলানুগই থাকলেন—

"তরুগণ স্নিগ্ধ ছায়া দেয় যেখানে।"

বরং শেষ পংক্তিতে এসে বুদ্ধদেব বসু কিছুটা পরিবর্তন করলেন। 'জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু' –এর অনুবাদ করলেন—

"এবং জলধারা জনকতনয়ার স্নানের স্মৃতি মেখে পুণ্য।"

সংস্কৃত ব্যাকরণে এবং, কিন্তু প্রভৃতি অব্যয়ের ব্যবহার অপরিহার্য ছিল না। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর কবিতা গদ্যভঙ্গির পক্ষপাতী বলে সেখানে এই সব অব্যয়ের বহুল সার্থক ব্যবহার দেখা যায়। কবির এক বন্ধু পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রথম পর্বে 'জলের ধারা যার' লিখতে তাহলে 'জলের ধারা যার / জনকতনয়ার' – এই মধ্যমিলও পাওয়া যেত। কিন্তু কবির বিশ্বাস 'এবং' বাদ দিলে শ্লোকের চেহারা তথা চার পংক্তির ঘনসন্নিবদ্ধ রূপ শিথিল হয়ে যেত।[১০]

কালিদাসের কাব্যের দ্বিতীয় শ্লোকের অনুবাদে 'অবলাবিপ্রযুক্তঃ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ' (প্রিয়াবিরহে কৃশ হওয়ার ফলে যক্ষের মণিবন্ধ থেকে সোনার কাঁকন খসে পড়েছিল) যক্ষের ছবি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখলেন—

"ভাবনায় শুষে তার অঙ্গ সমুদয়
হস্ত হতে খসি পড়ে স্বর্ণের বলয়।"

এক্ষেত্রে প্রথম চরণটির ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এভাবেই অনুবাদকের অন্তরাল থেকে কবি আত্মপ্রকাশ করেন। অনুবাদ হয়ে ওঠে নতুন সৃষ্টি। বুদ্ধদেব বসু আবার এই অংশটির অনুবাদে পূর্ণত আক্ষরিক।

"যখন আটমাস কাটলো সে-পাহাড়ে কান্তাবিরহিত কামুকের,
সোনার কঙ্কণ স্খলিত হয়ে তার শূন্য হ'লো মণিবন্ধ।"

এখানে 'আটমাস' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মূলে ছিল 'কতিচিৎ মাসান' বা কয়েক মাস। আসলে সম্পূর্ণ কাব্যটি পাঠ করলে দেখা যাবে, উত্তরমেঘে যক্ষ বলছে আর চারমাস পরে তার শাপমুক্তি ঘটবে। সেদিক থেকে হিসেব করলে নির্বাসনের আটমাস কেটে গেছে। এক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু বিশ্লেষণাত্মক অনুবাদের আশ্রয় নিয়েছেন।

তৃতীয় শ্লোকের প্রথম পংক্তির অনুবাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর করেননি। বুদ্ধদেব বসু পুরোপুরি আধুনিক বাংলা ভাষায় এই অংশটির অনুবাদ করেছেন—

"যক্ষ কোনোমতে চোখের জল চেপে ভাবলে মনে মনে বহুক্ষণ,"

'অন্তর্বাষ্প'-এর অনুবাদ হল 'চোখের জল চেপে'। আরো একটি পরিবর্তন তিনি করেছেন। মূলে 'যক্ষ' শব্দটি ছিল না; ছিল 'রাজরাজস্য অনুচরঃ' অর্থাৎ রাজার রাজা তথা যক্ষরাজের অনুচর। কবি শব্দবন্ধটির নিগলিতার্থ অনুবাদে ব্যবহার করেছেন। 'অনুবাদকের বক্তব্য' প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন, যেখানে যেখানে অনূদিত পংক্তিটি ঠিক আধুনিক বাংলায় দাঁড়িয়ে গেছে, সেই সবক্ষেত্রেই তিনি সর্বাধিক তৃপ্তি পেয়েছেন। যেমন পূর্বোদ্ধৃত পংক্তিটি। মূল শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তিতে কবি কালিদাস একটি চির পরিচিত সুভাষিতানি প্রয়োগ করেছেন, "মেঘালোকে ভবতি সুখিনোহপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ/ কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে"— মেঘ সন্দর্শনে সুখীদের চিত্তও আনমনা হয়ে যায়; সেক্ষেত্রে কণ্ঠালিঙ্গনে উৎসুক ব্যক্তি দূরে থাকলে তার কথা আর কী বা বলব? এই পংক্তির অনুবাদে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন—

"ঘনোদয়ে সুখীদেরও টলি যায় মন।
কেমনে থাকিবে স্থির বিলাসী যে জন।।"

'অন্যথাবৃত্তিঃ'-এর রূপান্তর করলেন কবি 'মন টলে যাওয়া'। আর 'কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জন'-এর অনুবাদ হল 'বিলাসী যে জন'। আক্ষরিক অনুবাদের থেকেও তিনি ছন্দমিল বজায় রেখে ব্যাখ্যামূলক অনুবাদের অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। বুদ্ধদেব বসু এই পংক্তিটির আক্ষরিক অনুবাদ করলেও অর্থ সুপরিস্ফুট করার জন্য দুটি বিশেষণ সংযোজন করেছেন। 'নবীন' মেঘ এবং 'মিলিত' সুখীজন।

"নবীন মেঘ দেখে মিলিত সুখীজন তারাও হয়ে যায় অন্যমনা,
কী আর কথা তবে, যদি সে দূরে থাকে যে চায় কণ্ঠের আলিঙ্গন।"

এই আকুতির সঙ্গে মিলে যায় বৈষ্ণব কবিতায় কৃষ্ণবিহনে শ্রীরাধিকার ব্যাকুল আর্তি— 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর' (বিদ্যাপতি) ।

চতুর্থ শ্লোকে মূলের 'জীমূত' শব্দটি বিশেষ লক্ষণীয়। জীমূত বা মেঘের দ্বারা যক্ষ তার প্রিয়াকে কুশলবার্তা পাঠাবে বলে ঠিক করেছে। জীমূত : জীবন মূত (বদ্ধ) যার দ্বারা। জীবনের এক অর্থ জল। জল ও জীবন এই দুটি অর্থই কালিদাসের অভিপ্রেত ছিল বলে মনে হয়; যে মেঘের মধ্যে জল আবদ্ধ আছে, সেই দ্যৌতক্রিয়া করে যক্ষপ্রিয়াকে নবজীবন দান করবে। এই ভাবনা থেকে বুদ্ধদেব বসু 'জীমূত'- এর অনুবাদে 'জলধর' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এত ব্যাখ্যায় না গিয়ে সরাসরি জীমূতের চলতি সমার্থক শব্দ 'মেঘ'ই ব্যবহার করেছেন। আলোচ্য শ্লোকে যক্ষ 'কূটজ কুসুম'-এর অর্ঘ্য নিবেদন করেছিল মেঘকে। কূটজ কুসুমের অর্থ বুদ্ধদেব বসু করেছেন 'কুরচি ফুল'।

অন্যদিকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনো বিশেষ ফুলের কথা না বলে লিখেছেন 'নানা জাতি পুষ্প'। যক্ষ যেহেতু মেঘকে প্রীতিপূর্বক মধুর সম্ভাষণ জানিয়েছিল, তাই বুদ্ধদেব বসু মেঘকে 'মেঘবর' রূপে উল্লেখ করে কাব্যার্থ আরো যথাযথ করেছেন—

"স্বাগত সম্ভাষ জানালে মেঘবরে মোহন, প্রীতিময় বচনে।"

অন্যদিকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন—

"অতঃপর জলধরে কহে সম্ভাষিয়া-"

পঞ্চম শ্লোকে একটি চিরায়ত সূক্তি ব্যবহার করেছেন কালিদাস—

"কামার্তা হি প্রকৃতকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।"

অর্থাৎ চেতন অচেতনের বিচারে কামার্তগণ স্বভাবতই কৃপার পাত্র হয়ে থাকে। যার বিশ্লেষিত অর্থ কামুকব্যক্তি চেতন অচেতনের ভেদ করতে পারে না। কালিদাসের বক্তব্যকে বিশ্লেষণধর্মী বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা বুদ্ধদেব বসুর উদ্দেশ্য ছিল সেকথা আগেই বলা হয়েছে। সেই কারণে তিনি লিখলেন—

"চেতনে-অচেতনে দ্বৈত অবলোপ, তাইতো কামুকের স্বাভাবিক।"

প্রিয়ার বিরহে কাতর হয়েই যক্ষের এই পরিণতি; এই কারণ ব্যাখ্যা মূল শ্লোকে না থাকলেও বুদ্ধদেব বসু 'গুহ্যক' (গুহাবাসী এক্ষেত্রে যক্ষ) শব্দের বদলে 'ব্যগ্র বিরহী' বিশেষণ প্রয়োগ করলেন। এর ফলে একাকী নির্বাসিত যক্ষের বিরহতাপিত চিত্ত পাঠকের কাছে আরো পরিস্ফুট হল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আবার 'কামার্ত' শব্দটিই পুরোপুরি বর্জন করলেন। তাঁর সময়কালে ভিক্টোরীয় নীতিবোধের প্রভাবে সাহিত্য নীতির শাসনে আবদ্ধ হতে শুরু করেছিল। সেই কারণে দেখা যায়, শ্লীল অশ্লীলের মাপকাঠিতে বিচার করে আদিরসের উচ্ছ্বাসপূর্ণ বেশ কিছু শ্লোক অনুবাদ করার সময়ে বর্জন করেছেন তিনি। যেমন পূর্বমেঘ ৪২, উত্তরমেঘ ৩৫ ইত্যাদি। আলোচ্য শ্লোকে কামুক যক্ষের বিরহী সত্তাকে অধিক গুরুত্ব দিলেন কবি—

"অচেতন মেঘ সে চেতন করি মানে,
স্মরের প্রভাব এত বিরহীর প্রাণে।"

ষষ্ঠ শ্লোকে ভুবনখ্যাত বংশজাত মেঘকে সম্বোধন করে যক্ষ তার কাছে আনুকূল্য চেয়েছে। এই শ্লোকেও একটি সুভাষিতানি ব্যবহার করেছেন কালিদাস—

"যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।"

অর্থাৎ গুণবানের কাছে প্রার্থনা করে বিফল হওয়াও শ্রেয় তথাপি অধম ব্যক্তির কাছে প্রার্থনায় সফল হওয়া নয়। গুণীজনের পরিবর্তে 'মহৎ' শব্দের প্রয়োগ ব্যতীত এই বাক্যটির পূর্ণত আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

"মহতে যাচঞা যদি নিরর্থকও হয়
সেও ভালো, তথাপি অধমে কভু নয়।"

কিন্তু বুদ্ধদেব বসু এই অংশের অনুবাদ আধুনিক বাংলায় করতে গিয়ে বাক্যের প্রকাশভঙ্গিই পরিবর্তন করে ফেলেছেন।

"গুণীরে অনুনয় বিফল সেও ভালো, অধমে বর দিলে নিতে নেই।"

সপ্তম শ্লোকে অলকার পরিচয় হিসেবে বলা হয়েছে 'যক্ষেশ্বরাণাং বসতি'। এর আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর —

"যে স্থানে অলকাপুরী থাকে যক্ষগণ,"

অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসু 'যক্ষপুর' শব্দের আমদানি করেছেন। তাঁর অনুবাদের একটি বৈশিষ্ট্য হল তিনি একদিকে যেমন আধুনিক বাংলায় মেঘদূতের রূপান্তর করতে চেয়েছেন; তেমনই বেশ কিছু গুরুগম্ভীর তৎসম শব্দ ব্যবহার করে সংস্কৃতের স্বাদও কিছুটা বজায় রাখতে চেয়েছেন। লেখনরীতি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য,

> "খাঁটি বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা ও ভঙ্গির মিশ্রণ এখানে এমনভাবে ও এতদুর পর্যন্ত ঘটেছে, যা আধুনিক বাংলা কবিতার অভ্যাসকে অতিক্রম করে যায়।"[১১]

এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে 'হরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্যা' অংশের অনুবাদে—

"যক্ষপুরে যাবে, অলকা নাম, তার আছেন উদ্যানে শম্ভু,
সৌধশ্রেণি তাঁর চন্দ্রমৌলির ললাট-জ্যোৎস্নায় ধৌত।"

এর বিপরীতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদ করেছেন সরল বাংলায়—

"বাহির উদ্যানে বসি বিরাজেন হর,
ভাল-শশী আলো করে যত বাড়ি-ঘর।"

অষ্টম শ্লোকে 'পবনপদবীম্ আরূঢ়ং' মেঘের অনুবাদকালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আকাশপথিক'-এর মতো কাব্যিক শব্দ প্রয়োগ করেছেন।

"বায়ুপৃষ্ঠে ভর করি আঁধারিয়া দিক
হইবে যখন তুমি আকাশপথিক।"

চারিদিক আঁধার করে আকাশপথিক মেঘের চলার দৃশ্যটি কবির নিজস্ব সংযোজন। মূলে না থাকলেও এই সংযোজন অনুবাদটিকে কাব্য হিসেবে সুন্দর করে তুলেছে। এইজন্যেই অনুবাদতাত্ত্বিকেরা সৌন্দর্য ও অসতীত্ব পরস্পর সম্পৃক্ত বলে দাবি করেন। বুদ্ধদেব বসু আবার এই অংশের অনুবাদে একেবারেই আক্ষরিক—

"যখন আরোহণ করবে বায়ুপথে, পথিক-বণিতারা অলক তুলে"

"উদগৃহীত অলকান্তাঃ পথিকবণিতাঃ"-এর অনুবাদে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আবার মূল থেকে সরে এসে ব্যাখ্যামূলক অনুবাদের দিকে ঝুঁকেছেন।

"বিরহিণী তোমায় দেখিবে আঁখি তুলে"

'পথিকবণিতা' অর্থাৎ দেশান্তরগামী পান্থদের স্ত্রীগণ যে বিরহিণী তাতে কোনো সন্দেহ নেই; তবে অলকচূর্ণের বদলে 'আঁখি' শব্দের ব্যবহার বোধহয় ছন্দমিল বজায় রাখার কারণেই।

এভাবে দেখা যাবে, প্রতিটি শ্লোকেই অনুবাদকদ্বয় মূলানুগ থেকেও কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করেছেন। আক্ষরিক, মুক্তানুবাদ ও ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ প্রয়োজনমতো হাত ধরাধরি করে চলেছে। বর্তমান প্রবন্ধের পরিসর সীমাবদ্ধতার কারণে প্রতিটি শ্লোকের তুলনামূলক বিশ্লেষণ স্থগিত রাখা হল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বুদ্ধদেব বসু দুজনেরই অনুবাদ নিয়ে নিজস্ব ভাবনাচিন্তা ছিল। মেঘদূতের পুনর্লিখনকালে অনুবাদকসত্তার আড়াল থেকে মাঝেমধ্যেই তাঁদের কবিসত্তা, কবিতা সম্পর্কে নিজস্ব চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। ফলত অনুবাদ পরিণত হয়েছে অনুসৃজনে।

৫

এতক্ষণের এই আলচনা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, উৎসপাঠ এবং উদ্দিষ্ট ভাষা এক হলেও দুটি অনুবাদ সৃষ্টি হিসেবে পৃথক মর্যাদার অধিকারী। অনুবাদতত্ত্ব অনুযায়ী, অনুবাদক ভিন্ন ভাষায়, ভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে মূল রচনার পুনর্জন্ম ঘটান। তাই তিনি 'স্রষ্টা' মর্যাদার অধিকারী। সময়, মাধ্যম, বিষয়, সমস্যা, স্থানগত ভেদ, সংস্কৃতিগত ভেদ, কবিচেতনার পার্থক্য — ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে অনুবাদ সর্বদাই মূল থেকে কিছুটা সরে আসে। সে কারণেই তাকে 'বিচ্ছুরিত পুনঃপাঠ' বলা হয়। মূলানুগ থেকেই ব্যাখ্যার স্বাধীনতা অনুবাদক ভোগ করেন; ফলে তৈরি হয় নতুন তাৎপর্যমণ্ডিত উদ্দিষ্ট পাঠ।

বর্তমান নিবন্ধে মেঘদূত কাব্যের মূল পাঠ এবং দুটি অনুবাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে 'বিচ্ছুরিত পুনঃপাঠ'-এর তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠার একটি প্রচেষ্টা করা হল।

Reference :

১. ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'অনুবাদতত্ত্ব', 'প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব', ৩য় সং, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬, পৃ. ১৩৯

২. ভট্টাচার্য, তপোধীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

৩. চৌধুরী, প্রমথ, 'তরজমা', 'প্রবন্ধসংগ্রহ', জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ২০১৩, পৃ. ৪৫৭

৪. বসু, বুদ্ধদেব, 'অনুবাদকের বক্তব্য', 'কবিতা সংগ্রহ চতুর্থ খণ্ড', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪, পৃ. ৬৩

৫. https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/14523

৬. ভট্টাচার্য, তপোধীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

৭. বসু, বুদ্ধদেব, 'ভূমিকা : সংস্কৃত কবিতা ও 'মেঘদূত', 'কবিতা সংগ্রহ চতুর্থ খণ্ড', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪, পৃ. ১৫

৮. বসু, রাজশেখর, 'ভূমিকা', 'কালিদাসের মেঘদূত', কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৪২২, পৃ. ১

৯. বসু, বুদ্ধদেব, 'অনুবাদকের বক্তব্য', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

১০. বসু, বুদ্ধদেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

১১. বসু, বুদ্ধদেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

Bibliography :

ঘটক, কল্যাণীশঙ্কর, 'মেঘদূত-জিজ্ঞাসা', তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, রত্নাবলী, ২০১২।

জানা, নরেশচন্দ্র, 'অনুবাদে মেঘদূত : সার্ধশতবর্ষ', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, সাহিত্যলোক, ১৯৯১।

বসু, বুদ্ধদেব, 'কবিতা সংগ্রহ চতুর্থ খণ্ড', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪।